স্বৈরতন্ত্রের কলকবজা বনাম তত্ত্বযুদ্ধ

মুসা আল হাফিজ

ঐতিহ্য

অর্পণ

ড. এম. আবদুল আজিজ

বই প্রসঙ্গে

ফ্যাসিবাদের বুদ্ধিবৃত্তিক পাহারাদারি ও খেদমতগিরির বিরুদ্ধে মুসা আল হাফিজ বরাবরই ছিলেন সোচ্চার। স্বৈরতন্ত্রের বিপরীতে গণবুদ্ধিজীবিতাকে তিনি বিকশিত করতে লড়েছেন। জনগণের জীবন সংকট, উপেক্ষিত কথন, নাগরিক অধিকার এবং জীবন ও সম্মানের মূল্য প্রতিষ্ঠায় বুদ্ধিজীবীদের কেন সোচ্চার হওয়া দরকার এবং কেন ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করা দরকার, তার বয়ান হাজির করেছেন বিরতি না দিয়ে।

কঠোর সমালোচনা করেছেন সেই বুদ্ধিবৃত্তিক প্রবণতার, যা ফ্যাসিবাদের জুতা সেলাই করছে, তার গণবৈরী কর্মকাণ্ডের পক্ষে সম্মতি তৈরি করছে এবং বৈধতার ভাষ্য নির্মাণ করছে। ক্ষমতার পদসেবাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। শাসনযন্ত্রের নাট-বল্টু হিসেবে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকার গোটা প্রক্রিয়াকে করতে চেয়েছেন দিগম্বর। বিপরীতে সত্য, গণআকাঙ্ক্ষা ও ইনসাফের জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক বয়ান ও লড়াইকে বলীয়ান করতে তিনি প্রেরণা, যুক্তি ও বৌদ্ধিক বয়ানের বিস্তার করেছেন। জনগণের আজাদির জন্য চিন্তার আজাদি ছিল তার অভিমুখ।

স্বৈরতন্ত্র কতিপয় তত্ত্বের ওপর ভর করে নিজের শাসন-শোষণকে ন্যায্যতা দিত। বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে নিজের শাসনের বৈধতা উৎপাদন ও সংহত করার চেষ্টা করত। এসব কৌশল রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিসরে পরিচালিত হয়। কৌশলগুলো যেসব তত্ত্বের আশ্রয়ে পরিচালিত হতো, মুসা আল হাফিজ এসবের সাথে লড়াই করেন।

আতঙ্ক সৃষ্টি ও শক্তির ব্যবহারকে তিনি চ্যালেঞ্জ করেন। মিডিয়া নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রাষ্ট্রের অর্জনগুলোকে অতিরঞ্জিত করে দেখানো এবং নিজেদের 'জনগণের রক্ষক' হিসেবে উপস্থাপন করার প্রচেষ্টাকে নস্যাতে তিনি প্রয়াস চালান।

কম গণতন্ত্র, বেশি উন্নয়ন, বিকল্পহীন কারিশম্যাটিক নেতৃত্বের ভাবমূর্তি, বিভাজন ও বাইনারি, ইসলামোফোবিয়া, বিশেষ চরিত্রের বাঙালি সংস্কৃতি ইত্যাদির ওপর সওয়ার হয়ে বিভ্রান্তির জট তৈরি করে নিজের শাসনকে অপরিহার্য বলে তুলে ধরেছে স্বৈরতন্ত্র। মুসা আল হাফিজ এই প্রয়াসের তত্ত্বীয় খোলস উন্মোচন করেছেন একের পর এক।

এমনতর রচনাবলির একটি চয়নিকা এই বই।

–প্রকাশক

সূচি

ওয়ান/ইলেভেন ও রাষ্ট্রের চরিত্রগত সওয়াল ১১
ভারতীয় আধিপত্য বাংলাদেশের কৌশল ও প্রতিরোধের নীতি ১৬
গণমাধ্যম : দীর্ঘ হানিমুন ও ক্ষমতার জুতা পালিশ ২৮
দুঃসময়ে বুদ্ধিজীবীর আপন লড়াই ৩৫
বুদ্ধিজীবিতা : দায়িত্বশীল 'মগজ' কিংবা বিপজ্জনক 'বর্জ্য' ৪১
বুদ্ধিবৃত্তি : ক্ষমতার খেদমত না সত্যের আমানত? ৪৭
অরুন্ধতী রায় ও লেখকের আজাদি ৫৩
কম অধিকার, বেশি উন্নয়ন তত্ত্ব ও বিচার ৫৭
ম্যাকিয়াভেলির রাজনীতিতত্ত্ব ও আজ ৬১
বিকল্প কে? জনগণ! ৬৭
অরওয়েলের 'পশুর খামার' বনাম গণশত্রু স্কুয়েলারগণ ৭০
রাজনৈতিক সচেতনতা, রাজনৈতিক সংস্কৃতি ৭৭
দুঃসময়ের অন্ধকারে ঈদ : নতুন পয়গাম ৮৩
কালচারাল হেজিমনি ও রাজনৈতিক দাসত্ব ৮৭
'শয়তানের ডালকুত্তা ও সাংস্কৃতিক মুক্তির দিশা' ৯৩
জল আর পানির বিতণ্ডা প্রসঙ্গে ৯৮
গুণগত পরিবর্তন অপরিহার্য ১০৫
বাংলা নববর্ষ ও মনুবাদ ১০৮
কে দেবতা, কে অসুর? ১১২

ওয়ান/ইলেভেন ও রাষ্ট্রের চরিত্রগত সওয়াল

রাষ্ট্র কখন তার নৈতিকতা হারায়? যখন ক্ষমতা ন্যায়ের বদলে নিয়ন্ত্রণকে বানায় মূলনীতি এবং ভুলে যায় নিজের সীমা ও দায়িত্ব। রাষ্ট্র নৈতিকতা হারালে জনগণ হারায় ভবিষ্যতের অধিকার। আমরা এমন এক সময়ের মুখোমুখি, যখন কথাগুলো বারবার মনে জাগছে। আমরা দেখছি, রাষ্ট্রের গহিন স্তরে আত্মবিশ্বাসের সংকট। কারণ ক্ষমতা এখন জনগণের প্রতিনিধিত্বে নেই, আছে নির্মম অভিনয়ে, চোখ রাঙানিতে।

বাংলাদেশের জন্য ১/১১ এক রাজনৈতিক বাস্তবতা। এই বাস্তবতা অস্বীকারের উপায় নেই। ওয়ান/ইলভেন পরবর্তী সরকারকে একটি সাময়িক প্রশাসনিক ব্যবস্থা কিংবা দুর্নীতিবিরোধী সক্ষমতার রণমঞ্চ হিসেবেই দেখাচ্ছেন অনেকেই। তাদের সাথে একমত নই।

ওয়ান/ইলেভেন শুধু ক্ষমতার স্থানান্তর নয়; বরং একটি দার্শনিক সংকট। রাষ্ট্রের ধারণা ও সাংবিধানিক সত্তার মাঝে এ এক ভাঙনের সংকেত। আমরা দেখছি রাজনীতির প্রতি ঘৃণা তৈরির জোর প্রচারণা। মাইনাস টু কোনো রাজনীতির ভেতর থেকে আসেনি, এসেছে এমন জায়গা থেকে, যারা রাজনীতির বাইরে থেকে রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চান। তারা নিয়ন্ত্রণ করতে চান রাজনীতিকে, কিন্তু তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করছে কে? কারা?

কোন পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব বিরাজনীতিকীকরণের পথে যেতে বাধ্য হয়? যে পরিস্থিতিতে এটা ঘটে, তাতে বৈধতার সংকট থাকেই।

ওয়ান/ইলেভেন কোনো সংকটের সুরাহা নয়, আমার বিচারে সে নিজেই এক সংকট। জোট সরকারের অপশাসন, দুর্নীতি ও ব্যর্থতার সাপেক্ষে একে আশীর্বাদ বলে হাজির করা হলেও আমি তাকে আলো বলতে পারছি না। সে আলেয়া প্রমাণিত হবে। এটা আপনিও টের পাবেন, যখন আজকের সংকটের গোড়ায় নজর দেবেন।

সংকটের মূলে রয়েছে ক্ষমতার প্রকৃতি ও রাষ্ট্রের সত্তা সম্পর্কে মেরুকরণ। রাষ্ট্র মানে কি কেবল শক্তির প্রয়োগ? নাকি রাষ্ট্র হচ্ছে জনগণের ঐক্য ও চেতনার বাহক? ওয়ান/ইলেভেনে আমরা দেখলাম এক 'সীমাবদ্ধ রাষ্ট্র'। যে রাষ্ট্র জন-অভিব্যক্তির গুরুত্বকে উপেক্ষা করছে। শাসকবর্গ নিজেদের ক্ষমতার কর্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছেন। এই ক্ষমতা যদি জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছাড়া একচেটিয়াভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে সেই রাষ্ট্র কি সত্যিই জনগণের প্রতিনিধি?

এই প্রশ্নের উত্তর আমাদেরকে নিয়ে যায় রাষ্ট্রের আত্মপরিচয় বা সত্তার প্রশ্নে। রাষ্ট্র কীভাবে জনতার অধিকার ও শক্তিকে ধারণ করে? সে কি তা ধারণ করবে নাকি কেবলই শাসন করবে? আজকের ক্ষমতাবানরা শাসন করছেন প্রবল প্রতাপে। কিন্তু জনতার অধিকার ও শক্তিকে ধারণ করছেন আদৌ? ওয়ান/ইলেভেন হাজির করেছে এক বাস্তবতা। সেখানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তথাকথিত শিরোনামে দেখছি এখতিয়ার বহির্ভূত ক্ষমতাচর্চা। কিন্তু ক্ষমতার বাধাহীন ও দ্বিধাহীন এই কসরতের ভিত্তি দেখছি না। বাংলাদেশের সংবিধান ৭২ এর সাংবিধানিক বুনিয়াদের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। বড় অর্থে এর জনকল্যাণী সংস্কারের জরুরত আছে। সেটা আরেক আলাপ। বিদ্যমান সংবিধানে রাষ্ট্র ও ক্ষমতার অস্তিত্বের ভিত্তি তার 'জনবৈধতা'। এই বৈধতা যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে রাষ্ট্রের অস্তিত্বই প্রশ্নবিদ্ধ হয়।

সংবিধানের ১৩তম সংশোধনী (১৯৯৬) তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে নিশ্চিত করেছে। সাংবিধানিকভাবে তার কাজ কী?

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান কাজ হলো নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া এবং এমন পরিবেশ তৈরি করা যেখানে কোনো দল বা গোষ্ঠী প্রভাব বিস্তার করতে না পারে। কিন্তু প্রায় দুই বছর হয়ে গেল। এই সরকার নির্বাচন স্থগিত রেখেছে। এটি কি সংবিধানের ধারাবাহিকতার পরিপন্থি নয়? এতদিনের কাজ দেখে মনে হচ্ছে, সামনে সামরিক হস্তক্ষেপ ও গোয়েন্দা নিয়ন্ত্রণে নির্বাচন কমিশনের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত হবে। এই আশঙ্কা অমূলক নয়। সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে। এগুলো সংকটের সমাধান মনে হলেও তা রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বে রূপ নিচ্ছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নৈতিক অধিকারের ভিত্তি কী? এই ভিত্তি হলো নিরপেক্ষতা। তারা দলীয় নয়। কাজেই তাদের কাজ হবে দলনিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করা। কিন্তু উভয় প্রধান রাজনৈতিক দলনেত্রীকে গ্রেফতার করে দ্বৈত নেতা নির্বাচন বা তৃতীয় শক্তি প্রতিষ্ঠার গোপন বাসনা লুকাতে পারছে না এই সরকার। সরকার তার নৈতিক ভিত্তিকে

ধসিয়ে দিচ্ছে নিজেই। সে রাজনৈতিক সংস্কারপন্থিদের সমর্থন করছে, কিংস পার্টি তৈয়ার করছে, মূলধারার দলগুলোতে বিভাজন ঘটানোর কোশেশ চালাচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে নতুন কোনো রাজনৈতিক শক্তির উত্থান ঘটানোর ক্ষমতা এই সরকারের নেই। তবে দলীয় রাজনৈতিক ভারসাম্যকে হুমকির মুখে ফেলার ক্ষমতা সে দেখাচ্ছে। রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেফতার বা নেতাদের দলত্যাগে বাধ্য করার ধারা চলমান। সব রাজনীতিক দুর্নীতিবাজ।

এমন চিল্লাচিল্লিতে মুখর মিডিয়া। এগুলো উত্তেজনা প্রশমিত করছে? না; বরং আরো ঘনীভূত করবে। রাজনৈতিক সহানুভূতিকে ধ্বংস করবে। সমস্ত কিছুর মাধ্যমে এই সরকার বলতে চাচ্ছে, রাজনীতি নয়, উন্নয়ন চাই। আহা উন্নয়ন! এই প্রচারণা দিয়ে জনগণকে খুশি খুশি ঘুম পাড়াবার চেষ্টা চলছে। কিন্তু আমি বলি, রাজনীতি না থাকলে যে জনগণ খুশি হবেন, অধিকার না থাকলেও তাদেরকে খুশি থাকতে হবে। প্রশাসনিক আধিপত্য বাড়ছে। সামরিক বাহিনী হয়ে উঠছে মূল নীতিনির্ধারক, প্রশাসন ব্যবহৃত হচ্ছে রাজনৈতিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের হাতিয়ার হিসেবে। র‍্যাব, সেনাবাহিনী, এবং গোয়েন্দা বাহিনীর ওপর প্রশাসন অতিমাত্রায় নির্ভরশীল। মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগও বড় হচ্ছে। রাজনৈতিক নেতৃত্বকে দুর্নীতির নামে হেয় করা হলেও, স্বচ্ছ বিচার প্রক্রিয়া নিশ্চিত হচ্ছে না।

রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও আলোচনার সংস্কৃতি চোখে পড়ছে না। শাসনব্যবস্থার নিরপেক্ষতা ও নৈতিকতা অদৃশ্য, যা দৃশ্যমান, তা হলো আরোপিত সংস্কারবাদিতা।

এগুলো কী বার্তা দেয়? রাষ্ট্রের চরিত্রে আমলাতান্ত্রিক ও পুলিশি খাসলত বাড়ছে। আগামীতে নির্বাচিত সরকার এলেও শাসন থাকবে র‍্যাব-পুলিশ-গোয়েন্দাদের গোপন বন্দোবস্তে। বস্তুত পরবর্তী শাসক কে হবেন, এর ইঞ্জিনিয়ারিং যদি এই ক্ষমতাচক্র করে বসে, অবাক হব না। রাজনীতি যদি বাংলাদেশে না ফিরে, তাহলে উন্নয়নের গল্প শোষণের নতুন অধ্যায়ে আমাদের টেনে নেবে।

পাঠক ভাবতে পারেন, বিদ্যমান সংকটকে আমি নিছক রাজনৈতিক বা শাসনতান্ত্রিক মনে করছি। আমার মতে, সংকট শুধু রাজনৈতিক নয়; বরং দার্শনিক। একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর হাতে একচেটিয়া ক্ষমতা কি আদৌ থাকা উচিত? এই এককেন্দ্রিক ক্ষমতার ধারণা কি রাষ্ট্রের নৈতিকতা ও সাংবিধানিক ভিত্তির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ? ওয়ান/ইলেভেনের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ক্ষমতা যদি নৈতিকতার বাইরে যায়, তাহলে সেটি হিংস্র হয়, অনিবার্যভাবে বিধ্বংসী হয়।

অতএব, আগামী দিনের বাংলাদেশে রাষ্ট্র ও ক্ষমতা নিয়ে আমাদের ভাবনা ও কর্মকাণ্ডকে পুনর্বিবেচনা করতে হবে– গণকল্যাণের মৌলিক শর্তাবলিকে কায়েম করতে হবে, এ ছাড়া রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতা সম্ভব নয়। যেখানে ক্ষমতার যথেচ্ছ প্রয়োগ থাকবে, সিলেক্টেড বিচার থাকবে সেখানে 'জনতার অধিকার' ও 'নৈতিক দায়বদ্ধতার' কথা সোনার পাথুরে বাটি। এই বাটিতে এখন দুর্নীতিবিরোধী অভিযান ও উন্নয়ন পরিবেশন করা হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় বাহিনীগুলো বলতে গেলে নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার।

ওয়ান/ইলেভেনের অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতের জন্য বিপজ্জনক। যেসব প্রবণতা দেখছি, তা ভোটের মাধ্যমে আগত সরকারেও যদি স্থায়ী হয়, বাংলাদেশের খবর আছে। মানে, জনতার খবর আছে। তাদেরকে পিষ্ট হতে হবে ক্ষমতার পায়ের তলায়। এটাই তো হচ্ছে। এটাই যেন জনতার নিয়তি!

কিন্তু একটি রাষ্ট্রের সাফল্য কী দিয়ে মাপা হয়? সেটা মাপা হয় তার জনগণের সম্মান, অংশগ্রহণ এবং ঐক্যের বিচারে, শক্তির প্রয়োগে নয়। রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে তার জনশক্তির মুক্তির পরিধির সাপেক্ষে, ক্ষমতার চক্রান্তের সাপেক্ষে নয়।

আমাদের দরকার রাজনৈতিক চিন্তা ও দার্শনিক অনুসন্ধান। আমরা শুধু অতীতকে বিচার করব না; বরং ভবিষ্যতের জন্য এক নতুন রাষ্ট্রতত্ত্ব ও ন্যায়ভিত্তিক নীতি গঠনের আহ্বান জানাব।

রাষ্ট্র যখন একান্ত কিছু ক্ষমতার কৌশলের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে, তখন সে আর রাষ্ট্র নয়– সে হয় একটি ছায়া, একটি উপস্থাপন, একটি কৃত্রিম নির্মাণ। রাষ্ট্র যখন তার জনবলের পরিবর্তে ক্ষমতার ব্যবহারকে ভিত্তি বানায়, তখন সে রাষ্ট্র আত্মবিরোধী এক নিষ্ঠুর পরিহাসে ডুবতে থাকে।

আমরা এখন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। রাষ্ট্র আর সমাজের মাঝে এক ছায়াযুদ্ধ চলছে। এখানে জনগণ নীরব, কিন্তু নিস্তব্ধ নয়। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সংকট গভীর থেকে গভীর হচ্ছে। রাষ্ট্র ও ন্যায়ের ধারণাকে ঘিরে যেসব মৌল প্রশ্ন রয়েছে, তার জবাব অনুপস্থিত।

রাষ্ট্র যদি ন্যায়ের বাহক না হয়, তাহলে সে কীসের বাহক? রাষ্ট্র যদি জনতাকে ধারণ না করে, তাহলে সে কাকে ধারণ করে? রাষ্ট্রের নৈতিকতা যদি কেবল উন্নয়নের মোড়কে আত্মগোপন করে, তাহলে সেই উন্নয়ন কি মানুষের নয়? নাকি কেবল ক্ষমতার নিজস্ব আয়োজন? আপন প্রয়োজন?

এই প্রশ্নগুলো কম উচ্চারিত হলেও এগুলোই জরুরি সওয়াল। এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

আজকের বাস্তবতায় খুব দরকার রাষ্ট্রের আত্মজিজ্ঞাসা। দরকার এক নতুন রাষ্ট্রতত্ত্ব– যেখানে অধিকার হবে সংবিধানের প্রাণ, আলোচনা ও সহযোগিতা হবে শাসনের ভিত্তি এবং ইনসাফ হবে ক্ষমতার উৎস, জনকল্যাণ হবে শাসনের লক্ষ্য ও অন্তিম অর্থ।

কেবল উন্নয়ন দিয়ে চলবে না, ন্যায়কে মুখ্য বানাতে হবে। গোয়েন্দা নজরদারিমূলক রাষ্ট্র চাই না, জিম্মাদারি ও জবাবদিহির রাষ্ট্র চাই। রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রতিপত্তি কামনা করে। কিন্তু সেই প্রতিপত্তি প্রতাপে থাকবে না; বরং এর উৎস হবে ন্যায্যতা, সততা ও জনগণের অংশগ্রহণ। ক্ষমতা যখন জনতার হাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তখন রাষ্ট্র একটি বন্দিশালায় পরিণত হয়।

বন্দিশালায় পরিণত রাষ্ট্র চকচক করে বটে, কিন্তু তা সোনা নয়। আর সোনা হলেও তা আমাদের নয়, আমাদের সন্তানদের নয়; শাসকশ্রেণির।

সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান
২৮ জুন, ২০০৮

ভারতীয় আধিপত্য
বাংলাদেশের কৌশল ও প্রতিরোধের নীতি

বাংলাদেশ একটি ভয়াবহ ভূরাজনৈতিক চক্রব্যূহে বন্দি। দক্ষিণ এশিয়ার এই ভূখণ্ড ভৌগোলিকভাবে ভারত দ্বারা বেষ্টিত। ভূগোল তো বদলানো যায় না। কিন্তু নিরাপত্তাজাত ভূগোল বদলে। কৌশলগত দিক থেকে বাংলাদেশ এখন ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ধারণার একটি বহির্বেষ্টনীতে পরিণত হয়েছে। এটা কীভাবে ঘটল? ঘুমের ভেতর থেকে কিছু বুদ্ধিজীবী বলবেন, এটা তেমন খারাপ কিছু নয়। এটি বরং হবারই কথা। কারণ তা প্রাকৃতিক বা আত্মিক বন্ধনের বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু একজন শিশুও বোঝে, এই বুদ্ধিজীবীরা মিথ্যা বলছেন। এটা ঘটেছে সুনিপুণ পরিকল্পনার ফলে। যার নেপথ্যে রয়েছে একাধারে সামরিক, কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক আগ্রাসন।

ভারতের আগ্রাসন সীমান্তবর্তী হত্যার ঘটনায় আবদ্ধ নয়, নদী দখলের মধ্যেও সীমাবদ্ধ নয়। তা বহু ক্ষেত্রে, বহু ধারায় দৃশ্যমান।

১. **পানি-কূটনীতি ও নদী-নিয়ন্ত্রণ:** গজলডোবা, ফারাক্কা, টিপাইমুখ ইত্যাদি ব্যারাজ প্রকল্পের মাধ্যমে ভারত অব্যাহতভাবে বাংলাদেশের উজানের নদীগুলোর প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করছে। এতে কৃষি ও পরিবেশ বিপর্যয় ক্রমবর্ধমান। বাংলাদেশ প্রশ্নে ভারতের পানিনীতি একপ্রকার হাইড্রোপলিটিক্যাল ব্ল্যাকমেইলের অংশ।

২. **সীমান্তে হত্যা ও টহল-আগ্রাসন:** ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (BSF) বাংলাদেশি নাগরিকদের গুলি করছে, হত্যা করছে। সীমান্ত হত্যা বন্ধ হয়নি, হয় না। এটা এক ক্রমবর্ধমান রক্তপাতের একপাক্ষিক গল্প। এখানে প্রতিটি মৃত্যু সীমান্তকে ফিলিস্তিনের গল্প শোনায়। কারণ ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সীমান্তে একপাক্ষিক হত্যার যে সিলসিলা, সেই ধারায় দ্বিতীয় নজির হচ্ছে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত।

৩. **অর্থনৈতিক অনুপ্রবেশ ও বাজার-দখলনীতি:** বাংলাদেশের বাজারে ভারতের পণ্যপ্রবাহ বলতে গেলে একমুখী। বাংলাদেশের স্থানীয় শিল্প হুমকির মুখে। যে সরকার আমাদের বাজারকে সুরক্ষা দেবে, তাদেরই কিছু গোষ্ঠীর সহায়তায় ভারতের অর্থনৈতিক মনোপলি প্রতিষ্ঠা হচ্ছে।

৪. **কৌলীন্য কূটনীতি : সংস্কৃতি ও নরম শক্তি :** বাংলাদেশে ভারতীয় চ্যানেল ও সিনেমার রমরমা। এটা বাণিজ্যিক আগ্রাসনের অংশ। যেখানে এই চ্যানেল ও সিনেমা যায়, শুধু সাংস্কৃতিক আধিপত্য নিয়ে যায় না, ভারতীয় পণ্যের প্রতি কৃত্রিম চাহিদা তৈরির বিজ্ঞাপন আর প্রচারণা নিয়েও যায়। এই চ্যানেল ও সিনেমার মাধ্যমে তারা বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকে চ্যালেঞ্জ করছে। চিন্তা ও মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করছে। ভাষিক আধিপত্যও বিস্তার করছে। যা দীর্ঘমেয়াদে জাতিসত্তার বিপন্নতা ডেকে আনবে।

৫. **রাজনৈতিক প্রভাব ও নিরাপত্তা-আসক্তি:** বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি পক্ষকে ব্যবহার করে আরেক পক্ষকে কোণঠাসা করছে ভারত। অপরদিকে আঞ্চলিক সন্ত্রাস রুখতে যৌথ নিরাপত্তার নামে বাংলাদেশের ভেতরে ভারতীয় নজরদারির ব্যবস্থা করছে।

এই যে আগ্রসন, তা সম্ভব হতে পারছে কেন? তা কীভাবে হতে পারছে ক্রমবর্ধমান? অবশ্যই বাংলাদেশের নীতিগত দুর্বলতা ও অক্ষম বা অনুগত নেতৃত্বের দায় এখানে ব্যাপক। এর পাশাপাশি রক্ষাকবচহীন কূটনীতি বড় অর্থে চোখে পড়ে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রতিক্রিয়াশীল ও আপসপ্রবণ। ভারতের সঙ্গে অসম চুক্তিসমূহ জাতীয় স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিচ্ছে। সরকারের গণবিচ্ছিন্নতা এবং অভ্যন্তরীণ ঐকমত্যের অভাব আরেকটি বড় কারণ। জাতীয় নিরাপত্তা প্রশ্নে জনগণের অভিপ্রায়ের প্রতিফলন নেই সরকারি নীতিতে। নিরাপত্তা ইস্যুতে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐক্য অনুপস্থিত। সিভিল সোসাইটি এ ব্যাপারে শুধু উদাসীন নয়; বরং আগ্রাসনের জমি তৈরিতে অনেকেই সক্রিয়। মিডিয়ার ভূমিকা কূটনীতির চেয়ে আরো ম্রিয়মাণ। কিংবা জাতীয় অর্থে আত্মঘাতী। ফলে আগ্রাসনের প্রেক্ষিতে রাষ্ট্র দুর্বলভাবে প্রতিক্রিয়া জানায়। আরেকটি গুরুতর কারণ হলো সামরিক ও গোয়েন্দা সক্ষমতার সীমাবদ্ধতা। বাংলাদেশ এখনো একটি কার্যকর সামরিক কৌশল তৈরি করতে পারেনি। প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বৃদ্ধিতে আমরা এক পা-ও অগ্রসর হইনি। সাইবার ও স্ট্র্যাটেজিক গোয়েন্দা খাতে বাংলাদেশের প্রস্তুতির ঘাটতি মর্মান্তিক।

এই প্রেক্ষিতে উত্তরণের রূপরেখা কী হবে? একটি বাস্তববাদী ও আত্মমর্যাদাপূর্ণ রূপকল্প কেমন হতে পারে? এক্ষেত্রে প্রস্তাব করব–

১. নিরাপত্তা কাঠামোর পূর্ণ সংস্কার:

ক. জাতীয় নিরাপত্তা নীতিমালা (National Security Doctrine) প্রণয়ন জরুরি।

এটি হবে আনুষ্ঠানিক নীতিপত্র, যেখানে রাষ্ট্রের সামগ্রিক নিরাপত্তা দর্শন সংজ্ঞায়িত হবে। নিরাপত্তা অগ্রাধিকার, কৌশল ও হুমকির বিশ্লেষণ থাকবে। এই নীতিমালা সামরিক নিরাপত্তার নীতি হাজির করবে। একই সাথে সাইবার, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার সামগ্রিক কাঠামো উপস্থাপন করবে। এটা এজন্য জরুরি যে, বাংলাদেশ এখনো এডহক ভিত্তিতে নিরাপত্তা ইস্যু সামলায়। এখানো কোনো Threat Matrix নাই, যার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হবে– কে বন্ধু, কে হুমকি ইত্যাদি। নিরাপত্তার মতো স্পর্শকাতর ইস্যুতে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো সমন্বিতভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে না। একেক প্রতিষ্ঠান একেকভাবে প্রতিক্রিয়া জানায়। যা আরো বিভ্রান্তি তৈরি করে। বস্তুত জাতীয় স্বার্থ নির্ধারণে একটি core doctrine থাকা জরুরি, যাতে সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে পারে।

কিন্তু কী থাকবে এই নীতিমালায়?

- Primary Threat Perception : ভারতীয় জল-নির্ভরতা, সীমান্ত হত্যা, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক প্রভাবের দিকগুলো
- National Interest Definition : ভূখণ্ডের অখণ্ডতা, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার মতো বিষয়।
- Strategic Response Doctrine : হাইব্রিড ওয়ারফেয়ার মোকাবিলায় সামরিক ও অ-সামরিক উপায়।
- প্রতিরক্ষা সক্ষমতা উন্নয়ন পরিকল্পনা : সেনা, বিমান, নৌ ও সাইবার শক্তির অভ্যন্তরীণ লক্ষ্য।

কারা এটি প্রণয়ন করবে? এই নীতিমালা প্রণয়ন করবে জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল (NSC)। কিন্তু মুশকিল হলো এখনো কার্যকরভাবে এই কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এই নীতিমালায় সেনাবাহিনী, র‍্যাব, ডিজিএফআই, এনএসআই, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিত্ব থাকবে।

(খ) আঞ্চলিক ভারসাম্যে কৌশলগত মিত্রতা : চীন, মালয়েশিয়া, তুরস্ক, ইরান ও মুসলিম বিশ্ব : ভারতের একতরফা ভূ-আগ্রাসন রুখতে বাংলাদেশকে Counterweight Alliances তৈরি করতে হবে। যারা একই সাথে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামরিক ও কূটনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা করতে পারে। কিন্তু কেন এই দেশগুলো? এই দেশগুলোর কথা বলছি, কারণ–

চীন ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী, Bangladesh-China-India-Myanmar (BCIM) করিডরের মাধ্যমে এখানকার বাস্তবতায় কৌশলগত প্রভাব রাখে। মালয়েশিয়া মুসলিম গণতন্ত্র ও প্রযুক্তির মডেল, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর। তার প্রাসঙ্গিকতা এখানেও কাজ করবে। তুরস্ক : প্রতিরক্ষা শিল্পে উদীয়মান শক্তি; বাংলাদেশের সঙ্গে তুরস্কের ঐতিহাসিক সম্পর্ক ঐতিহ্যে রূপান্তরিত হয়েছে। তুরস্ক বরাবরই আমাদের সমর্থক। ইরান : ভারত-আমেরিকা জোটের বাইরে থাকা একটি বলিষ্ঠ আঞ্চলিক শক্তি। তার সক্ষমতা বাংলাদেশকে সহায়তা করতে পারে। মুসলিম বিশ্বের প্ল্যাটফর্ম বা OIC উল্লেখযোগ্য ভূমিকা বলতে গেলে রাখে না। কিন্তু ভারতীয় আধিপত্যের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক জনমত তৈরিতে মুসলিম জাহান আমাদের কৌশলগত প্ল্যাটফর্ম।

কীভাবে এই মিত্রতা গড়া সম্ভব? প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। মিত্রতা তৈরি হবে প্রথমত, সামরিক সমঝোতার মধ্য দিয়ে। যৌথ প্রশিক্ষণ, অস্ত্র ক্রয়, সামরিক প্রযুক্তি স্থানান্তর প্রক্রিয়ায়। চীনের মতো রাষ্ট্রের সাথে যৌথ নিরাপত্তা চুক্তি প্রণয়ন করা যায়।

দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক করিডরের মধ্য দিয়ে। চীন-মালয়েশিয়ার সঙ্গে Special Economic Zone গড়া যায়, রেলপথ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হতে পারে।

তৃতীয়ত, কূটনৈতিক ফোরাম। UN ও OIC-এ একসঙ্গে অবস্থান ও লবিং। ব্রিকস এর মতো জোটে বাংলাদেশ জায়গা করে নিতে প্রয়াসী হবে। আসিয়ানে কোনো লেবেলে যুক্ত থাকার উপায় সন্ধান করতে হবে।

চতুর্থত, মানবিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা : মেডিকেল, কৃষি ও শিক্ষা খাতে যৌথ উদ্যোগ বাড়াতে হবে।

২. জল-কূটনীতিতে আক্রমণাত্মক উদ্যোগ

(ক) UN Watercourses Convention-এ সক্রিয় অংশগ্রহণ : আন্তর্জাতিক জলপথের নন-নেভিগেশনাল (অ-নাব্য) ব্যবহারের ওপর জাতিসংঘ সনদ, ১৯৯৭

(UN Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses, 1997) একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি, যা আন্তর্জাতিক নদীর পানি ব্যবস্থাপনায় 'ন্যায্য ও যৌক্তিক বণ্টন' (equitable and reasonable utilization) নিশ্চিত করে।

বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে এই কনভেনশন র‍্যাটিফাই করে আন্তর্জাতিক ফোরামে ভারতের নদী-নিয়ন্ত্রণনীতিকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। চুক্তিভিত্তিক আন্তর্জাতিক আপিল I Water Sharing Dispute Tribunal-এ মামলা দায়ের করতে পারে।

এতে ভারতের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ তৈরি করা যাবে। ভারতের একতরফা পানি প্রকল্পগুলো আন্তর্জাতিক আইনে প্রশ্নবিদ্ধ হবে। একই সাথে নদী ইস্যুকে মানবিক-পরিবেশগত বিপর্যয়ের বিষয় হিসেবে তুলে ধরা যাবে।

(খ) সার্ক-এ মাল্টিলেটারাল চ্যালেঞ্জিং ফ্রেমওয়ার্ক

ভারত দীর্ঘদিন ধরে সার্ক (SAARC) কে অকেজো করে রেখেছে। কিন্তু এই প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে বাংলাদেশ নদী বণ্টন ইস্যুকে আঞ্চলিক বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করতে পারে। সার্ক ওয়াটার কাউন্সিল গঠনের আহ্বান জানাতে পারে। সব দেশ মিলে Equitable River Sharing Protocol গ্রহণ করে ভারতের unilateral action-এর বিরুদ্ধে সম্মিলিত অবস্থান গ্রহণ করতে পারে।

বাংলাদেশ-পাকিস্তান-নেপাল-ভুটান সম্মিলিতভাবে ভারতের জল-দখলনীতির বিরুদ্ধে কনসোর্টিয়াম তৈরি করতে পারে। এর ফলে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতীয় একচেটিয়া মাতব্বরি প্রশ্নবিদ্ধ হবে। নেপাল-ভুটানও সাহস পাবে নিজেদের নদী ইস্যুতে কথা বলতে। একই সাথে আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দাতা গোষ্ঠী দক্ষিণ এশিয়ার জল সংকটে ভারসাম্যহীনতাকে গুরুত্ব দেবে।

সার্ক অ্যাক্টিভ না হলেও পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপের মতো দক্ষিণ এশীয় রাষ্ট্রগুলোর সাথে সুসম্পর্ক বাংলাদেশকে নিশ্চিত করতে হবে।

৩. সীমানা সুরক্ষা ও নীতিগত প্রতিরোধ

(ক) সীমান্তে টেকসই টেকনোলজিক্যাল মনিটরিং জরুরি। শুধু বাহিনীর উপস্থিতি সীমান্ত সুরক্ষার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর 'Surveillance Warfare' -ও একালে গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে (৪,০৯৬ কিমি) ভারতীয় নজরদারি সরঞ্জামের উপস্থিতি ক্রমবর্ধমান। ২০০০ সালের পর থেকেই ভারতের নজরদারি ড্রোন, থার্মাল ক্যামেরা, সেন্সর এবং জিও-ট্র্যাকিং ব্যবস্থার আধিপত্য চলছে আমাদের সীমান্তে। কিন্তু বাংলাদেশ এখনো প্রথাগত নিরাপত্তা পদ্ধতিতে আটকে আছে।

এমতাবস্থায় বাংলাদেশের করণীয় কী?

প্রথমত, ইলেকট্রনিক বর্ডার সিকিউরিটি সিস্টেম (EBSS) গড়ে তোলা, যা হবে থার্মাল ইমেজিং, নাইট ভিশন ও মুভমেন্ট ডিটেকশন প্রযুক্তিনির্ভর।

দ্বিতীয়ত, প্রতিটি বর্ডার কিলিং-এর ভিডিও প্রমাণ সংরক্ষণের জন্য সীমান্তে দিক-নির্দেশিত ক্যামেরা ও ক্লাউড বেজড স্টোরেজ।

তৃতীয়ত, AI-Assisted Border Monitoring System (এআই-সহায়ক সীমান্ত পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা) আধুনিক, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক প্রযুক্তিনির্ভর নিরাপত্তা ব্যবস্থা যা সীমান্তে প্রবেশ, অনুপ্রবেশ, চোরাচালান ও অবৈধ কার্যকলাপ শনাক্ত, পর্যবেক্ষণ ও প্রতিরোধ করতে ব্যবহৃত হয়। যা রিয়েল টাইমে সন্দেহজনক যেকোনো অনুপ্রবেশ শনাক্ত করতে পারবে।

(খ) BSF-এর প্রতিটি আগ্রাসনের প্রতিক্রিয়ায় আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় 'অ্যাক্টিভ ডিজিটাল প্রোটেস্ট' জরুরি। সীমান্ত হত্যা ও নির্যাতনকে ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে দেখা ও দেখানো ধ্বংসাত্মক আত্মঘাত। এটি অবশ্যই মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক ইস্যু। কিন্তু বাংলাদেশ রাষ্ট্র নিজেই এ বিষয়ে নীরব থাকে। এখানে দরকার ডিজিটাল ডিপ্লোম্যাসি ও মিডিয়া অ্যাক্টিভিজম।

এ জায়গায় যা করণীয়, তার মধ্যে আছে, প্রথমত, BSF Killing Database. প্রতিটি হত্যার তথ্য, ছবি, ভিডিও ও ভুক্তভোগীর পরিচয় সংরক্ষণ করে বহুভাষিক অনলাইন রিপোর্টিং প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা।

দ্বিতীয়ত, Real-Time Global Tweetstorm; বিশ্বজুড়ে একই সময়েই, কোনো একটি নির্দিষ্ট ইস্যু, হ্যাশট্যাগ বা বার্তা নিয়ে টুইটারে একসঙ্গে বিপুল পরিমাণে টুইট ছড়িয়ে দেওয়া, যেন তা ভাইরাল হয় এবং বিশ্বব্যাপী নজর